শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

বুলবন ওসমান

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
বুলবন ওসমান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯৩

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স
২৮/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য : ২৪০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Bulbon Osman
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 240.00 $8

ISBN : 978-984-98737-7-8

উৎসর্গ

উম্মে আতিয়া আলো
আশিক রানা
আছিয়া বেগম
বিপ্লব মিয়া
যারা সবাই আমার জন্যে যমের দুয়ারে কাঁটা দিতে ব্যস্ত

ভূমিকা

স্বনির্বাচিত গল্প সংকলন করার একটা সুবিধা আছে। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হয় না। লেখকের নিজের ভালো লাগাই প্রধান। হয়তো অন্যের দৃষ্টিতে বেশ কিছু ভালো লেখা বাদ পড়তে পারে। কি করা যাবে। অন্য সংকলনে তা জায়গা নেবে।

১৯৬৭ সালে আমার কিশোর উপন্যাস 'কানামামা' সেই বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিবেচিত হয়ে পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার দেয় তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড। ১৯৬৮ সালে লাহোর গিয়ে পুরস্কার নিয়ে আসি। তখনকার দিনে পাঁচ হাজার রুপি খুব একটা কম নয়। যখন এই টাকায় গাড়ি পাওয়া যেত। সেই তরুণ বয়সে এক মাস গোটা পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে নিই। সেই প্রথম এবং এই পর্যন্ত শেষ পাওয়া।

১৯৭৩ সালে পাই বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার। সময়টা খুব খুব ভালো যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি থমকে যায়। আজকে আমরা সেই আঘাত সামলে উঠেছি। নতুন প্রজন্ম দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার পরিপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করবে এই আশা আমরা বয়স্করা করতেই পারি। তরুণদের জয় হোক।

বন্ধুবর লেখক মঈন আহমদ তাম্রলিপির পক্ষে বই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে সাধুবাদ পাবার দাবিদার। তার কর্মসঙ্গীদের সবাইকে শুভেচ্ছা।

বুলবন ওসমান
১৬.১.২০২৪
ঢাকা

সূচিপত্র

সুফেনের ময়ূর	১১
ছেঁড়াকাগজ, ফুলের তোড়া	১৫
সৎভাই	২০
সংবাদদাতা	২৬
বাদুড়ের বিদ্রোহ	৩৩
বল	৩৮
বিল্লি	৪৪
লস্‌সি	৪৯
খাসি	৫৪
ফাঁস	৫৯
জামা	৬৩
দেবপাহাড়ের পিকি	৬৯
রামছাগলের ছানা	৭৯
বিভার তেঁতুলাপেল	৮৫
বড়কুঠির মিরাবিলিস জালাপা	৯২
ব্যালকনিতে চড়ুইছানা	৯৯

সুফেনের ময়ূর

সুফেন যখন দাদুর বাড়িতে এল শীতের সকাল। কুয়াশা নেই। রোদে ঝলমল করছে গাছপালা। পাখির কিচিরমিচির যেন সুফেনকে ডাকছে। এসো, এবার আমাদের খেলা শুরু করি।

প্রথমেই তিন বছরের সুফেনের চোখে পড়ে লঙ্কাজবা গাছটা। সারা গাছে পাতার চেয়ে লাল লাল ফুলই যেন বেশি। সে একটা বুলবুলিকে দেখতে পেল। এডাল থেকে-ওডাল নাচানাচি করে মধু খাচ্ছে। বুলবুলিটাকে লেজ নাচিয়ে মধু খেতে দেখে সে ডাক দেয়, দাদু, দাদু দেখে যাও, বুলবুলি পাখিটা না, মধু খাচ্চে...একা...

ঘরের ভেতর থেকে দাদু তাকে বললে, তুমিও মধু খাও।

না আমি মধু খাব না। পাখিটাই খাক।

খাক তবে, দাদু বললে।

এই সময় আর একটা বুলবুলি গাছে এসে বসে। সুফেন আবার হাঁক ছাড়ে, দাদু, দাদু, আর একটা বুলবুলি এসেছে। এখন ওরা দুজন মিলে মধু খাচ্ছে।

খাক মধু।

তুমি দেখবে এসো, ওরা কেমন নাচানাচি করছে।

আসছি...

সুফেনের দাদু এসে দেখে একজোড়া বুলবুলি যাদের প্রায় রোজ দেখা যায় লঙ্কাজবা গাছে নাচানাচি করে মধু খাচ্ছে।

দেখেছ, বুলবুলিদের মাথায় ঝুঁটি, দাদু সুফেনকে বলে।

ওদের মাথায় ঝুঁটি কেন? সুফেন জানতে চায়।

ঝুঁটি থাকায় ওদের দেখতে সুন্দর লাগে, তাই আল্লা ওদের মাথয় ঝুঁটি দিয়ে দিয়েছে।

তাহলে আল্লাকে বললেই হয় সব পাখির মাথায় ঝুঁটি দিয়ে দিতে! কাকের মাথায়, চিলের মাথায়...সব পাখির মাথায়!

সব যদি এক রকম হয় ভালো লাগবে না, তাই সবার মাথায় ঝুঁটি দেয়নি।

আচ্ছা দাদু, আল্লা কি তাহলে খুব বড় শিল্পী?

তা বলতে পারো...বুলবুলিরা এখন মধু খাক, চল আমরা পেছনে যাই।

সুফেন দাদুর হাত ধরে।

দাদু সুফেনকে নিয়ে ঘরের পেছনে যায়।

ঘরের পেছনে বেশ কিছু ফলের গাছ। তার মধ্যে পেয়ারা গাছ বেশি। একটা আছে জলপাই গাছ। গাছের পাকা পাতাগুলো কেমন গাঢ় গোলাপি-লাল হয়ে উঠেছে। পাশে একটা কামরাঙা গাছ। বেশ কামরাঙা ধরেছে।

এই সময় ট্যাঁ ট্যাঁ করে কয়েকটা টিঁয়াপাখি গাছে এসে বসে।

সুফেন সবুজ গা, লাল ঠোঁট পাখিগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

দাদু বললে, পাখিগুলো এই গাছে কেন বসেছে বুঝেছ তো?

না।

ওরা কামরাঙা খাবে।

দেখি ওরা কেমন কামরাঙা খায়!

দেখ।

পাখিগুলো প্রথমে নিজেদের মধ্যে কি যেন গল্প জুড়ে দিল ট্যাঁ ট্যাঁ করে। তারপর লাফাল এ-ডাল থেকে ও-ডাল।

এক সময় সুফেন দেখে গাছতলায় কি যেন একটা পড়ল। সে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে দেখতে পায় একটা বড় কামরাঙা, আধ-খাওয়া।

দাদু, গাছ থেকে একটা কামরাঙা পড়ল।

আমি বলেছিলাম না, ওরা কামরাঙা খাবার জন্যে এসেছে! একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে দাদু পাখিগুলো তাড়ানোর জন্যে ছুঁড়ে মারে।

টিঁয়ারা ফড় ফড় করে উড়ে যায়।

দাদু, তুমি পাখি তাড়ালে কেন? সুফেন খুব মন খারাপ করে বলে।

পাখিরা সব কামরাঙা খেয়ে নেবে।

খাক না ওরা? ওদের তো কেউ খেতে দেয় না।

আচ্ছা ঠিক আছে, এবার এলে আর তাড়াব না। সুফেনকে খুশী করার জন্যে দাদু বলে। যদিও জানে পাখি না তাড়ালে একটা কামরাঙাও গাছে থাকবে না। পাখিগুলো কামরাঙা সব যে খায় তা নয়, শুধু শুধু কেটে কেটে ফেলে দেয়। কাঁচা পাকা সব। কেন যে এমন করে নষ্ট করে

বোঝা দায়। খেলে তো কথা ছিল না। শুধু শুধু বোঁটা কেটে ফেলে দেবে। কি যে ওদের আনন্দ কে জানে।

পাশেই একটা ডাবগাছ। গাছটা নতুন। ছোট ছোট ডাব ধরে আর ঝরে পড়ে। কয়েকটা কুশি ডাব কুড়োল সুফেন। কয়েকটা রঙিন জলপাই পাতা আর আধ খাওয়া একটা কামরাঙা... এইসব নিয়ে ফিরল। তারপর রকে এই কটা সাজিয়ে খেলতে লাগল। দাদু গেল নিজের কাজে।

দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে চলে।

সুফেন কিছু লঙ্কাজবা ফুলও কুড়িয়ে এনেছে।

ফুল সাজিয়ে করেছে ঘর।

বারান্দা দিয়ে কেউ যেতে গেলে তার ঘরকে বাঁচিয়ে যেতে হয়। যেন তার ঘরের ওপর দিয়ে কেউ না যায়, তাই সে কড়া পাহারা লাগিয়েছে।

ভুল করে একবার দাদুই ফুল মাড়িয়ে ফেললে সুফেন খুব রেগে গেল।

দাদু, তুমি আমার ঘর ভাঙলে কেন? আমি এক্ষুনি চলে যাব।

আমি খেয়াল করিনি ভাই, তাই কাণ্ডটা ঘটে গেছে। তুমি এবারের মতো মাফ করে দাও।

দাদুকে মাফ চাইতে দেখে সুফেনের রাগ পড়ে। সে বললে, ঠিক আছে, এবার কিছু বললাম না, আর যেন না হয়।

দাদু বললে, ঠিক আছে, আর হবে না।

ঘর পাহারা দিতে দিতে সুফেনের আরো বেশ কিছু সময় চলে গেল।

এবার স্নান করা দরকার।

দাদু তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্নানটা করিয়ে দেয়।

সুফেন দুধ খায়।

দুপুর হতে এখনো কিছু দেরি।

কি করে সময় কাটাবে সুফেন?

দাদু একটা রঙিন পেনসিল আর কাগজ এনে দেয়।

তুমি ততক্ষণ ছবি আঁক।

ঠিক আছে। তুমি বসো, আমি ছবি আঁকি।

আচ্ছা আমি বসছি।

বেশ কিছু এলোপাথাড়ি হিজিবিজি এঁকে সুফেন বলে, এবার আমি একটা টিঁয়াপাখি আঁকব।

টিঁয়াপাখির জন্যে সুফেনের মন খুব টানে। তার একটা টিঁয়াপাখি ছিল। ক'দিন আগে বেড়াল খেয়ে ফেলেছে।

সুফেন একটা পাখি আঁকল।

পাখিটার পায়ের নিচে একটা রেখা দিয়ে বসাল। তারপর মাথার উপর দিয়ে আর একটা রেখা টেনে লাইনে জুড়ে দিয়ে বললে, পাখিটা খাঁচায় বসে।

দাদু বললে, খাঁচা তো হলো, কিন্তু তার শিক কই?

সুফেন তখন একটা শেকল এঁকে দাঁড়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বললে, পাখি তো দাঁড়ে শিকল দিয়ে বাঁধা। শিক লাগবে না।

দাদু বেশ অবাক হয় তার ভাবনা দেখে। বললে, তা ঠিক বলেছ।

তারপর সে একটা রেখা টানলে দাঁড়ের বেশ কিছু উপরে।

দাদু বললে, এটা করলে কেন?

সুফেন উপরের রেখা থেকে আর একটা রেখা টেনে দাঁড়ে জুড়ে দিয়ে বললে, এটা মাটিতে থাকলে বিড়াল খেয়ে নেবে না? তাই ঝুলিয়ে দিলাম।

দাঁড়টা তখন শূন্যে ঝুলছে। মাটি থেকে উঠে গেছে।

এই সময় পেনসিলের শিষ ভেঙে যাওয়ায় সুফেন বললে, দাদু, এখন আর আঁকব না।

ঠিক আছে চল তবে খেয়ে নেবে।

খাইয়ে দাইয়ে সুফেনকে দাদু গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

বিকেলে সুফেনের মা এসে হাজির। হাতে লাল প্লাস্টিকের ব্যাগ। তাতে সব দরকারি জিনিস। সুফেনের কাপড়-চোপড়, দুধের টিন এমনকি দুধের শিশি ধোবার বুরুশ পর্যন্ত।

সবাই বসে গল্প করছে।

এমন সময় সুফেন বললে, এই ঘরে এমন একটা জিনিস আছে যা দিয়ে ময়ূর করা যায়। বল তো কি?

মা-দাদু কেউ বলতে পারল না।

ঠিক আছে আমি ময়ূর করে দেখাচ্ছি।

বলে সে মায়ের ব্যাগ থেকে দুধের শিশি ধোবার বুরুশটা বের করে। তারপর বুরুশের তারের দিকটা বাঁকিয়ে করে মুখ-মাথা-গলা আর পেছন দিকটা করে পেখম।

মা-দাদু সবাই অবাক হয়ে দেখে সুফেনের ময়ূর পেখম তুলে নাচছে।

ছেঁড়াকাগজ, ফুলের তোড়া

তিনজনের কাঁধে তিনটে চটের থলে। রফু আর মধুর বয়স দশ– পরনে কালো ছেঁড়া প্যান্ট, খালি পা, উচ্চতায় দুজন সমান। নাজুর বয়স আট, তারও উদোম গা, পরনে দড়িবাঁধা ডোরা প্যান্টালুন, কি যে তার রং ছিল বুঝবার উপায় নেই, ময়লা লেগে লেগে কালো হয়ে উঠেছে। মাথার কোঁকড়া চুল ঘাড় ছাপিয়ে গেছে। তেলের অভাবে চুল কটা।

রমনা থানার সামনে রাস্তার ওপারে লন্ড্রিটার পেছনে দুটো ছাপড়া আড়াল হয়ে রয়েছে। সামনে থেকে চোখে পড়ে না বলে ছাপড়া দুটো টিকে আছে। না হলে কবেই পুলিশ ভেঙে দিত। রফু আর নাজু পিঠোপিঠি ভাইবোন, মধু তাদের প্রতিবেশী।

রোজ সকালে তাদের মা-বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে তারাও থলে কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। মগবজার, ইস্কাটন ছাড়িয়ে তারা কখনো কখনো কাওরান বাজার পর্যন্ত যায়। এদিকে শাহবাগ, রমনা পার্ক, পাবলিক লাইব্রেরি, বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল সবই তাদের কাগজ কুড়ানোর জায়গা। বেলিরোড ধরে শান্তিনগর, মালিবাগ, রাজারবাগেও তাদের যাতায়াত চলে। তিনজনে ক্ষিপ্র হাতে কুড়িয়ে চলে যত পরিত্যক্ত কাগজ। তাদের এই ক্ষিপ্রতার কারণ কাগজ কুড়োনো ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু যে তারা তিনজন আছে তা নয়, আরো অনেক ছেলেমেয়ে এই কাজে কাঁধে থলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে যত আগে কুড়োতে পারে তার লাভ। না হয় সারা দিনেও এক থলে পুরবে না। এই কাগজ জমিয়ে জমিয়ে একদিন তারা মৌলবী বাজারে দিয়ে আসবে মহাজনের কাছে। তারা মন দরে কিনে নেবে। এই সব টুকরো কাগজ যাবে নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লায় হার্ডবোর্ড-পিজবোর্ড তৈরির কারখানায়। রফু, মধু আর নাজু ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই সকালে একবার বেলি রোড ধরে অফিসার ক্লাবের দেয়ালের পাশে এসে দাঁড়ায়। সকালে ক্লাবঘরটা নিশ্চুপ। কেউ নেই। টেনিস খেলার মাঠ ফাঁকা। বিকেলে এই জায়গার চেহারা পাল্টে যায়। অনেক গাড়ি। অনেক লোকজন। গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে খেলার মাঠে টেনিস বল নিয়ে

ছোটাছুটি। তাই কখনও কখনও বিকেলে আসে খেলা দেখতে। সকালে খেলা না থাকলেও তারা আসে অন্য একটা আকর্ষণে। অনেক কাগজ পড়ে থাকে। সারা রাতের জঞ্জাল ঝাঁট দিয়ে ঝাড়ুদার ফেলে দিয়ে যায়। আর কোনো পার্টি থাকলে খাবারের বাক্স কুড়িয়ে তারা চেঁটে চেঁটে খায়। সেদিন সকালে ওরা তিনজন অফিসার ক্লাবের দেওয়ালের পাশে হাজির। বেশ কিছু কাগজ পড়ে আছে। চটপট হাত চালায় তিনজন। কাগজ শেষ। আজ কোনো খাবারের বাক্স নেই যে তা নিয়ে চাঁটবে। না থাক। রোজ যে থাকবে এমন তারা আশা করে না। অনেক সময় দারোয়ান আর ঝাড়ুদার ঠোঙা বা বাক্স নিয়ে চলে যায়। কিন্তু গতকাল রাতে যে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তার চিহ্ন পড়ে আছে, বাক্স নয়, একটা তাজা ফুলের তোড়া। রাতের শিশির মেখে ফুলগুলো সতেজ। নাজু ফুলের তোড়াটা কুড়িয়ে নেয়।

তাকে ফুল কুড়োতে দেখে রফু বলে, ফেলাই দে, রাখনের কাম নাই।

না, রাখুম, সোন্দর ফুল, বলে নাজু।

হাতে ফুল রাখলে কাগজ টোকাবি ক্যামনে।

যখন কাগজ টোকামু ফুলগুলা মাটিত রাখুম।

দরকার নাই ঝামেলায়। ফালাই দে।

না, আমি রাখুম। নাজু জোর দিয়েই বলে। আমি বাড়ি নিমু।

ফুল কি খাওনের জিনিস! কি লাভ নিয়া।

না, আমি বাড়িত নিমু। নাজু জিদ ধরে।

বড়ভাই হিসেবে রফু তার জোর খাটাতে চায়, না, বাড়িত নিয়া কাম নাই, ফেলাই দে।

না, বলে নাজু।

রফু ফুলের তোড়াটা বের করে নর্দমায় ফেলে দেয়।

নাজু অনেকক্ষণ একভাবে ফুলের তোড়াটার দিকে চেয়ে থাকে। তোড়াটা আস্তে আস্তে ময়লা পানির নিচে তলিয়ে যায়।

একটা কথা বললে না নাজু, সে থলিটা কুড়িয়ে নিয়ে রমনা পার্কের দিকে হাঁটতে শুরু করে। আকাশে ঘন মেঘ। এই সময় বৃষ্টি নামে।

রফু-মধু একটা ঝাঁকড়া জামগাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এদিকে নাজু একমনে মাঝ রাস্তা দিয়ে চলেছে। বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে চলে তার কটা চুলের জট ধরে।

রফু চিৎকার করে, এই নাজু পানিত ভিজিস না...

দু'দিন আগে তর জ্বর ছিল।